OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 187 - 196
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্প : দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগের ভিন্ন আখ্যান

ড. প্রতাপ ব্যাপারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, শালবনি
Email ID : pratapbapari@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Shaukat Osman, Short Story, Rural Life, Famine, Communal Riot, Partition, Religious Hypocrisy.

Abstract

In Bengali literature, Shawkat Osman holds a distinguished position as a storyteller of rare talent. Known for his insightful perspective, satirical humour, profound social awareness, and bold impartial voice, Osman crafted a unique identity. As an astute observer of society, he captured the intricate dynamics of life, the diverse problems plaguing society, and the political turmoil of his time with exceptional skill. His literature seamlessly weaves personal experience with the complexities of social and political structures, creating an artistic reflection of the multifaceted world around him. Shawkat Osman was fearless and honest in his approach, speaking with clarity and a protester's spirit. His stories reveal a profound understanding of human life, using art to illustrate the evolving society and state. The shifting tides of society, politics, the instability of power, and the tensions between tradition and change are meticulously examined in his work, reflecting the currents of his era.

The core themes of famine, communal violence, and partition characterize his early stories. The social upheavals of this period are vividly depicted in his collections — 'Pinjarapol' (1951), 'Junu Apa and Other Stories' (1951), 'Sabek Kahini' (1953), and 'Bigoto Kale Galpo' (1987). As a socially conscious artist, Osman adeptly portrayed the changes and crises within society, particularly in rural settings. His stories highlight the relentless poverty and inequality that plague village communities, where people struggle daily under the weight of social, economic, and religious pressures. Victims of exploitative production relations, these individuals bear the pain of being uprooted and continually face hardship, losing what little they possess to the powerful in society. This sensitivity to the diverse crises of his time is delicately captured in the rich and nuanced narratives of his early short stories.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে শওকত ওসমান এক বিশিষ্ট প্রতিভাধর কথাশিল্পী হিসেবে নিজের আসন পাকা করেছেন। রচনাশৈলীতে বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যঙ্গমিশ্রিত রসবোধ, সমাজচেতনার নিবিড় উপলব্ধি এবং সাহসী ও নিরপেক্ষ কণ্ঠ তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। তিনি সমাজের গভীর পর্যবেক্ষক; জীবনের জটিল প্রেক্ষাপট, সমাজের বহুবিধ সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার খুঁটিনাটি তাঁর লেখায় অনন্য নৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সমাজ-রাষ্ট্রের জটিল উপাদান শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। শওকত ওসমান ছিলেন সাহিত্যে যেমন নির্ভীক ও সৎ, তেমনই স্পষ্টভাষী ও প্রতিবাদী। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে মানুষের জীবনচিত্রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল চিত্রকে শিল্পগুণে ফুটিয়ে তুলেছে। যুগ-পরিবর্তনের ধারায় সমাজ ও রাজনীতি, ক্ষমতার অস্থির প্রবাহ এবং ঐতিহ্যের টানাপোড়েন সবকিছু তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি কালের গতিময় চেতনা-প্রবাহকে পাঠকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর সাহিত্যে চিন্তার গভীরতা এবং মানবজীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশ করেছে।

শওকত ওসমানের গল্পকার জীবনকে একাধিক পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রতিচ্ছবি। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ভারতীয় সমাজ শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকারও হয়। যুদ্ধের প্রভাব সরাসরি আর্থিক ক্ষেত্রেও দেখা দেয়; ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া, ঔপনিবেশিক শাসকের মুদ্রানীতির কারণে মুদ্রাস্ফীতি — সবকিছু মিলিয়ে অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। এই দীর্ঘ শোষণ, শাসন, বিশ্বমন্দা এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে দেখা দেয় ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এর মাঝেই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ পাশ হয় মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাব বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব', যা মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমির দাবি তুলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়। ১৯৪১ সালে জাপানের ভারত আক্রমণ এবং পরের বছর গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। এরই মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ছায়ায় ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ঘটে যায় নির্মম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার ভয়াবহ স্মৃতি এবং দেশভাগের বেদনা নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে শওকত ওসমান কলকাতা ত্যাগ করে চিরতরে চলে আসেন পূর্ব-পাকিস্তানে।

দারিদ্র্যের আবরণে ঘেরা দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং দেশভাগ— এই ত্রিমাত্রিক ঘটনাবলিই শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্পগুলির কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। এই সময়ের অস্থির সমাজচিত্র তাঁর প্রকাশিত চারটি গল্পগ্রন্থে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে— 'পিঁজরাপোল' (১৯৫১), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৯৫১), 'সাবেককাহিনী' (১৯৫৩) এবং 'বিগত কালে গল্প' (১৯৮৭)-তে। সমাজসচেতন এক শিল্পী হিসেবে, সমাজের পরিবর্তন ও সঙ্কটকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তা তাঁর গল্পের উপজীব্য হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীণ সমাজের সীমাহীন দারিদ্র্য ও বৈষম্যের চিত্র, যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় চাপের ভারে ন্যুব্জ মানুষরা প্রতিদিন সংগ্রাম করছে টিকে থাকার জন্য। অসম উৎপাদন সম্পর্কের শিকার এসব মানুষ শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনা বহন করে চলেছে; তাদের জীবনে বারবার আঘাত আসে, সমাজের ক্ষমতাধরদের হাতে তারা ক্রমাগত নিঃস্ব হয়। এই বৈচিত্র্যময় সঙ্কটের রেখাচিত্র শওকত ওসমানের এই পর্বের ছোটগল্পগুলোতে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে বিধৃত হয়েছে।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ ছিল ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষগুলোর একটি। ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ শুধু খাদ্যাভাবের ফল নয়; এর পেছনে ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতের সম্পদ ও শস্য সরবরাহকে নিজস্ব সামরিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে। এতে খাদ্য সরবরাহে সংকট দেখা দেয়। ফলে এই দুর্ভিক্ষ ছিল একপ্রকার মনুষ্যসৃষ্ট সংকট। এর পাশাপাশি রেশন ব্যবস্থায় অসম বন্টন নীতি, স্থানীয় প্রশাসনিক অরাজকতা এবং আড়তদারদের বেআইনি শস্য মজুতের কারণে বাংলার গ্রামাঞ্চলে চরম দুর্দশা নেমে আসে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গেই আসে মহামারী। অনাহারের পাশাপাশি কলেরা, ম্যালেরিয়া, অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভিক্ষের সময় সমাজের ধনীদের ভূমিকা

ছিল অমানবিক ও শোষণমুখী। বিত্তবানরা নিজ স্বার্থে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও ধ্বংস করে দিয়েছিল এই সময়।

এই কঠিন বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস' গল্পে। গল্পে দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজের হৃদয়বিদারক চিত্র উঠে এসেছে। মন্বন্তরের কঠিন সময়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে মুনাফাখোর চোরাকারবারি আব্দুল জলিল তরফদার ও পুলিন সাহা রাতের আঁধারে ধান-চাল নদীপথে পাচার করে। এই দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে গ্রামের মানুষ একদিকে খাদ্যসংকটে, অন্যদিকে কলেরার আক্রমণে বিপর্যস্ত। এই পরিবেশে পুলিশের ডেপুটি মুস্তাফিজ সাহেব এক রাতে নদীপথ পাহারা দিতে গিয়ে বিশ-ত্রিশ মণ চালসহ জলিল তরফদারের নৌকা আটক করেন এবং সেখানেই দুর্ভিক্ষের অমানবিক রূপ তার সামনে উন্মোচিত হয়। কিন্তু সেই অন্ধকার রাতেই, আরেকটি নৌকা আটকালে দেখা যায়, এক যুবক কলেরা আক্রান্ত মৃত স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এই যুবকের সঙ্গে ডেপুটি মুস্তাফিজের কথোপকথনে উন্মোচিত হয় দুর্ভিক্ষের স্বরূপ —

> "— খুন আমরা করিনি।
>
> — তবে কে খুন করেছে?
>
> — হ্যাঁ আপনারা। ঘুষে চোরা-কারবারের সহায় হোয়ে আপনারা, যারা মানুষের বাঁচার সব আশ্রয়"[১]

এই উক্তিতে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ উন্মোচিত হয়েছে, যা মজুতদারদের লোভ ও নির্দয়তার প্রতি সরাসরি ইঙ্গিত দেয়। গল্পটি যেন একদিক থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার দলিল, অন্যদিকে মুনাফাখোর শ্রেণির অমানবিকতার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।

'ভাগাড়' গল্পে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামীণ মানুষের অসহায়ত্বের পাশাপাশি সমাজের ক্ষমতাশালী শোষকদের নির্মমতার চিত্র অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। মনসব আলি কুইনাইন, চাল, আটা, চিনি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের চোরাকারবারি চালিয়ে মন্বন্তরের মধ্যেও নিজের ধনসম্পদ বাড়িয়ে তোলে। দুর্ভিক্ষের কঠিন পরিস্থিতিতে, যখন গ্রামের লোকেরা খাদ্যাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, তখন সে কাউকে সামান্য অন্নদান করেনি, অথচ এখন সে তাদের গরুর মাংস খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু দরিদ্র মানুষগুলো এই দয়ার দান গ্রহণ না করে, সেই মাংস ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। মনসব আলি এর প্রতিবাদ করলে—

> "ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে একজন জবাব দিলঃ পঞ্চাশ সনে কাউর গরে চাউল ছিল না। আপনি দিছলেন কি?"[২]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুধু খাদ্যাভাবের দুর্যোগই ছিল না; এটি মানুষের মানবিকতা, স্নেহ-মমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সমাজকে এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছিল। মানুষ তখন আর কেবল মানুষ ছিল না; পরিণত হয়েছিল বাজারের পণ্য, কেনাবেচার সামগ্রীতে। দুর্ভিক্ষের তীব্রতায় অর্থের বিনিময়ে খাদ্য জোগাড় করা দুরূহ হলেও জীবন্ত নারী ও শিশুদের বিনিময়ে লেনদেন তখন সম্ভব ছিল। এই মানবিক সঙ্কট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অভাবী বাবা-মায়েরা কখনও সন্তানকে বিক্রি করে দেন কিছু অর্থের বিনিময়ে, আবার কখনও নিঃস্বতার গ্লানিতে নিঃস্বার্থভাবে তুলে দেন বিত্তবানদের হাতে। 'হুকুম নড়ে না' গল্পে ফুটে উঠেছে এমনই এক মর্মন্তুদ পরিস্থিতি —

> "এমন সময় ভিখারিনি মেয়েটাকে দুই হাতে তুলে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কারো যদি দয়া হয়, হুজুর, মেয়েটাকে নিয়ে যান। আমার কাছে থাকলে না খেয়ে মরে যাবে। কারো যদি মেহেরবানী হয়।"[৩]

এটি শুধু মন্বন্তরের এক গল্প নয়; বরং মানবিকতার অপচয়ের এক নির্মম দলিল, যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী বস্ত্র-সংকট কেবল একটি সাধারণ দুর্যোগ ছিল না; এটি সমাজের মনুষ্যত্বকে এক নির্মমভাবে উলঙ্গ করে দিয়েছিল। খাদ্যের সংকটের সঙ্গে ছিল বস্ত্রের এতটাই অভাব যে, তা সমাজের দেহ ও মানসিকতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। মন্বন্তরের দুঃসহ কষ্ট এবং বস্ত্র-সংকটের করুণ রূপ আমরা যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে পাই, তেমনি শওকত ওসমানের 'কাঁথা' গল্পেও এর প্রতিফলন দেখি। এই গল্পে গৃহস্থ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চাষি লতিফ ও তার স্ত্রী বরু-বিবির একমাত্র শাড়ির দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে তাদের অপার লাঞ্ছনার কাহিনি ফুটে উঠেছে। তাদের সংসারে এতই অভাব যে, শাড়ির অনুপস্থিতিতে বরু-বিবি কাঁথা জড়িয়ে দৈনন্দিন লজ্জা নিবারণ করতে বাধ্য হয়, যা প্রায়ই তাঁদের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। গল্পকারের ভাষায় এই সংকটের দুঃখগাথা ফুটে উঠেছে —

> "অনুরোধের ভঙ্গীতেই হঠাৎ লতিফ কাঁথা ধরিয়া টান দিল। একি! বরু-বিবি একদম উলঙ্গ। বিবস্ত্রার চেয়েও বেশী লজ্জা পাইয়া কাঁথা ছুড়িয়া দিল লতিফ স্ত্রীর উপর।"[৪]

দৃশ্যটি যেন চিরন্তন বঞ্চনার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কেবল বাহ্যিক বস্ত্রের অভাব নয়, বরং মানবিক মর্যাদার চরম অবনতির যে এক নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি, তারই দলিল এই গল্প।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পর বাঙালি সমাজকে আরেকটি চরম পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছিল ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার এই বিস্ফোরণ, এক অর্থে, রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দীর্ঘদিনের প্ররোচনার ফল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে সমাজের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে রেখেছিল, যা শেষপর্যন্ত বিস্ফোরণ আকারে প্রকাশ পায়। এই দাঙ্গার পর, প্রহসনের মতো করেই দুই পক্ষ নিজেদের 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'শান্তি কমিটি' স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে, শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এ ধরনের কমিটি গঠন ছিল অর্থ সংগ্রহের একটি উপায়, যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের জন্যই লাভজনক ছিল। 'চুহা-চরিত' গল্পে ছেচল্লিশের দাঙ্গার ক্ষত এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলের ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে —

> "দাঙ্গা চলিতে লাগিল। শান্তি কমিটি গজাইতে লাগিল। অনেক লোক চিচিং ফাঁক হইয়া গেল।"[৫]

এই ব্যঙ্গের ভাষায় ধরা পড়েছে সমকালীন সমাজের অসহায়ত্ব আর রাজনৈতিক শক্তির নিদারুণ অমানবিকতা। শান্তি রক্ষার নামে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল, তা আসলে সাধারণ মানুষের জীবনকে আরও অনিশ্চিত ও বিপন্ন করে তুলেছিল।

'থুতু' গল্পে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখ-বঞ্চনার এক গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফাদার জোহানেস এক সৎ ও ধর্মপরায়ণ যাজক হলেও সমাজের দুঃখ-দুর্দশা তার দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফাদারের গৃহভৃত্য মনসুর, তার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট ও শোককে নিয়ে অসহায়ভাবে দিনযাপন করে। এই শোক ও যন্ত্রণা মূলত তার মা ও বোনের মৃত্যু। তারা মারা যায় পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে, যা ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্য ও শোষণের পরিণতি। মনসুরের ক্ষোভ ধীরে ধীরে প্রতিশোধের রূপ নেয় এবং এই প্রতিশোধের উপায় হিসেবে সে বেছে নেয় তার শরীরে বাসা-বাঁধা যক্ষ্মার জীবাণু। ব্রিটিশ জনস্টন পরিবার এবং ফাদার জোহানেসের খাদ্যে মনসুর গোপনে নিজের থুতুর মাধ্যমে যক্ষ্মার জীবাণু মিশিয়ে দেয়। ফাদার জোহানেস যখন তার এই কাজের কারণ জানতে চান, মনসুর তার দায় স্বীকার করে। গল্পকারের ভাষায় —

> "ফাদার জোহানেস পাথরের মত স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেনঃ তোম মেরা খানামে থুক্ দেতা?
> — কভি কভি, ফাদার।
> মনসুর নির্ভীককণ্ঠে জবাব দিচ্ছে।
> — কিঁউ এয়সা কাম করতা?
> — মেরা বহেন কো আপনে দেখা। বেগায়ের খানা মেরা দেশকা বহুৎ আদমী- মেরা মা-
> মনসুরের গলা বুজে আসে। হঠাৎ মিইয়ে যায় সে। বক্তব্যের প্রকাশ-স্রোত ঝড়ে স্তব্ধ যেন।"[৬]

মনসুরের এই প্রতিশোধ কোনো ব্যক্তিগত বঞ্চনা নয়; এটি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের নিপীড়িত অংশের চাপা বিদ্রোহের প্রতীক, যা গল্পের মাধ্যমে এক গভীর প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে ওঠে।

জমিদার শ্রেণির প্রবল অর্থবিত্ত ও ক্ষমতার প্রদর্শন, নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি তাদের অবহেলা এবং পশুর প্রতি কৃত্রিম সমবেদনাকে গল্পকার তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করেছেন 'পিঁজরাপোল' গল্পে। গল্পে মহারাজা গণ্ডেরীরাম এক সাদা গাভির মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে একটি বিশাল পিঁজরাপোল বা পশুর ক্লেশ নিবারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পাঁচশ বিঘা জায়গাজুড়ে

স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানে পশুদের জন্য যেমন বিপুল আয়োজন, তেমনি মহারাজার নিজস্ব আরামদায়ক বাংলো এবং বাবুদের কোয়ার্টারও রয়েছে। কিন্তু বিপরীতে পশুদের দেখাশোনা করা চাকরদের জন্য নেই কোনো পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা— তারা পশুদের কোয়ার্টারে ঠাসাঠাসি করে বসবাস করে। এখানে ধনী শ্রেণির পশুর প্রতি যত্ন ও ভালোবাসা এবং নিম্নবিত্তের প্রতি উদাসীনতা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। নাইট উপাধিপ্রাপ্ত আসাদ আলীর গাভি যেমন আরামদায়ক মশারির নিচে থাকে, তেমনই অন্যদিকে কর্মচারীদের মশারি কিংবা ন্যূনতম জীবনযাত্রার সুবিধাও নেই। বিশ বছর ধরে মাত্র কুড়ি টাকায় চাকরি করতে থাকা এই প্রভুভক্ত মারু মিয়া আশা করেছিল, একদিন তার বেতন বাড়বে। গল্পকারের ভাষায়—

> "কিন্তু মারু মিয়ার মানস জগতের বিধাতারূপে শওকত ওসমান জানে, সে ভেবেছিল তার বেতন বাড়বে একদিন। এক কুড়ি টাকায় সে এই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে। আরো কুড়ি বছর পরে পিঁজরাপোল বেড়েছে। কিন্তু মারু মিয়ার বেতন তেমনি অচল দাঁড়িয়ে আছে।"[৭]

নিপীড়িত মানুষের অসহায়ত্ব, ধনিক-শ্রেণির স্বার্থপরতা এবং উপেক্ষার চিত্রটি নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে এখানে।

'বকেয়া' গল্পটি জমিদারতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও সমাজের অসাম্যের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পাঁচু, যিনি একসময়ে জমিদারের বিশ্বস্ত পেয়াদা ছিলেন, কিন্তু সময়ের প্রবাহে জমিদারের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েন। জমিদারের কাছে খাজনা বকেয়া থাকায়, তিনি পাঁচুকে তার পৈতৃক ভিটে ছাড়তে বাধ্য করেন। এই নিষ্ঠুর নির্দেশের ফলে পাঁচু তার বসতভিটা হারিয়ে পথে বসে। গল্পের বেদনাদায়ক মুহূর্তটি আসে যখন পাঁচুর মেয়ে টুনি অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সন্তানের প্রতি গভীর মমতায় পাঁচু তার মেয়ের মৃতদেহ একটি কলা গাছের ভেলায় ভাসিয়ে জমিদারের পুকুরে ভাসিয়ে দেয়। এ তার মতো হতদরিদ্র গরীবের সামান্য প্রতিবাদ। জমিদার, যিনি জীবিত টুনির জন্য সামান্য কুড়ি টাকা মাফ করতে রাজি হননি, সেই তিনিই টুনির মৃতদেহকে 'সরস্বতীর আশীর্বাদ' হিসেবে গ্রহণ করেন। জমিদার এই আশীর্বাদের জন্য তিনশো টাকা দান ও পূজার আয়োজনের নির্দেশ দেন, যা জমিদারের ভণ্ডামি ও নিষ্ঠুর মনোভাবকে প্রকাশ করে। শওকত ওসমান জমিদারতন্ত্রের এই নির্মম ও কপট আচরণের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। জমিদারতন্ত্রের ঠুনকো ভক্তি ও উপহাসাত্মক পূজার আড়ম্বরের পেছনে সাধারণ মানুষের দুর্দশার আখ্যানটি তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে —

> "জমিদার বাবু গলার উড়ানি জড়াইয়া বার বার মাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তিগদগদ হৃদয়। তাই দুই চক্ষুর অশ্রু উপচিয়া পড়িল।"[৮]

গল্পটির মাধ্যমে সমাজের শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি গভীর প্রতিবাদ ও সমবেদনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের নির্মম বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে 'দুই চোখ কানা' গল্পে। মুনশী, যিনি নিজের শ্রম ও সততায় মালিক চৌধুরীর কারখানার উন্নতির ভিত্তিপ্রস্তর গেঁথেছেন, তিনি মালিকের কাছে শুধুমাত্র আরেকটি ব্যবহৃত সম্পদ। যতক্ষণ তার শ্রমে কারখানার লাভ বৃদ্ধি পায়, ততক্ষণই তিনি দরকারি; কিন্তু যখন আধুনিকায়নের অজুহাতে দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তিনি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যান। মুনশীর প্রতি অবজ্ঞা ও অপমানের এই রূপ শ্রমিকশ্রেণির সার্বিক দুরবস্থারই পরিচায়ক। মুনশীর দীর্ঘ পরিশ্রম, তার নিবেদিত শ্রম, অবশেষে মালিকের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ মুনশীর শেষ আশা ছিল তার বছরের পর বছর ধরে জমিয়ে রাখা শ্রমের বিনিময়ে এক টুকরো নিরাপত্তা, কিন্তু মালিকের কাছে তা কেবল হিসাবের খাতায় একটা সংখ্যামাত্র। মালিক চৌধুরীর লোভ ও স্বার্থপরতার পেছনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণির প্রতি শোষকশ্রেণির বৈরী মনোভাব। মুনশীর অসহায় আর্তি যেন শ্রমিকশ্রেণির চিরকালীন প্রশ্ন হয়ে ফুটে ওঠে —

> "হুজুর, কত বছর এখানে কাটিয়ে দিলাম, এই বুড়ো বয়সে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব?"[৯]

কিন্তু শোষণের নির্মমতায় এই কাতর প্রশ্নগুলো কেবলই নিস্তব্ধ প্রতিধ্বনির মতো ফিরে আসে। শ্রমিকশ্রেণির শোষণের এই চিত্র সামাজিক সত্যকে গভীরভাবে অনুধাবন করিয়ে দেয়— যেখানে লাভ-ক্ষতির কাছে মানবিকতা মূল্যহীন এবং যে শ্রমিকদের তিলে তিলে নিঃশেষ করা হয়, তাদের মেধা ও শ্রমও নিঃশেষের পর আর কোনো মূল্য রাখে না।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সাদা ইমারত' গল্পটি হাসিনা নাম্নী নারীর পরিত্যক্ত জীবনের লাঞ্ছনার রূপরেখা। অসুখে ভুগছে বলে স্বামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর, অতি দরিদ্র পিতা কালুর সংসারে ঠাঁই নেয় সে। কালুর উপার্জনের পথ চৌর্যবৃত্তি। এই কাজে হাসিনার আপত্তি থাকলেও সংসারের তাগিদে সেও এই কাজের শরিক হয়। একদিন কলা চুরির মত তুচ্ছ কাণ্ডে বাবার সঙ্গী হলে, পথে খেজুরের কাঁটা বিধে যায় তার পায়ে, সেখান থেকে সংক্রমণ হয় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তাকে ভর্তি করা হয় এক বিশাল সাদা হাসপাতাল ভবনে। কিন্তু সেখানে কিছুদিন কাটার পর হাসিনার দেখা দেয় নতুন অসুখ— বসন্ত। ডাক্তার বসন্ত রোগীকে সেখানে রাখতে নারাজ। হতভাগ্য হাসিনাকে তাই ফিরে আসতে হয়। বাড়ি ফেরার সময় পথেই থেমে যায় তার জীবন-প্রবাহ। তার মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনায় গল্পকার বলেন—

> "হাসিনা একনিষ্ঠ চোখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে, যেন আল্লাহর প্রশান্ত নীল আকাশের অভিমুখে।"[১০]

যে 'সাদা ইমারত' তাকে সুস্থ জীবনে ফেরার আপাত আশ্বাস দিয়েছিল, চরম সংকটকালীন মুহূর্তে সেই সাদা ইমারতই তাকে ত্যাগ করলো। সাদা ইমারত সম্পর্কে এক সময়ের কৌতূহলী, রোমাঞ্চিত হাসিনা সমাজ, সংসার, এমনকি পৃথিবী থেকেও চিরতরে বিদায় নেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি অবহেলা আর দারিদ্র্যের নির্দয় প্রহার যে নারীজীবনকে পঙ্গু করে দেয়, তারই করুণ চিত্র গল্পটি।

'ব্যবধান' গল্পে দেখা যায় স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, উচ্চবিত্তের গর্ব এবং ভদ্রতার আড়ালে অন্তরের সংকীর্ণতা কীভাবে সম্পর্কের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি করে। রাসেদী দরিদ্র হওয়ার কারণে তার দুই বিত্তবান ভাইয়ের কাছ থেকে তুচ্ছার্থিক কারণে উপেক্ষিত হয়। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আরেকজন নামকরা ব্যবসায়ী— প্রতিপত্তি আর আভিজাত্যের দম্ভে তারা নিজেদেরকে ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি মনে করে। এই কৃত্রিম ভদ্রতা রাসেদীকে তাদের রক্তের সম্পর্ক থেকেই বিচ্ছিন্ন করে তোলে। তবু মাতৃহৃদয় থেকে সন্তান দূরে সরে না। মামী নুরী বিবির নিখাদ মমতা আর মঙ্গল কামনা প্রাচুর্যের চৌকাঠ মাড়ায় না, বরং নিঃস্ব রাসেদীর জন্য তার মনের আকুতি আরও গভীর হয়। সমাজের যক্ষপুরীতে বসবাস করেও নুরী বিবি অভিজাত জীবনযাপনের আস্বাদ পান না; তার মতোই নিঃসঙ্গ তার বিত্তহীন পুত্রসম ভাগ্নেয় রাসেদীও। বৃদ্ধা হওয়ার কারণে নুরী বিবির সঙ্গে ছেলে-বউয়েরও দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। নুরী বিবি, রাসেদীকে জানায় —

> "একা নিচে পড়ে থাকি, কেউ খোঁজও নেয় না, বাবা। কয়েদীর মতো সময় সময় খাবার দিয়ে যায়। হাত-খরচা বলে দুটো পয়সাও দেয় না।"[১১]

এ যেন প্রাসাদে থেকেও এক দুঃখময় বন্দিত্ব, যেখানে সেও আর দশজনের মতোই একজন উপেক্ষিত হতভাগ্য নারী। অর্থ সাহায্য না পাওয়া নিরাশ রাসেদী যখন বিত্তশালী ভাইদের কাছ থেকে ফিরে আসে, তখন তার চলার পথে এই সম্পর্কের ভঙ্গুরতা আর নিঃসঙ্গতার ব্যথা চিরন্তনভাবে ফুটে ওঠে —

> "এখানে বাহির দিগন্তের সীমানা, বিশাল মাঠের সূচনা। দশ-ক্রোশ পথ সম্মুখে। সড়কের পথে রাসেদী অনুভব করে সে আজ একা পরিব্রাজক নয়। তাহার দুই পাশে দুইজন যাত্রী। দুই জনের ছায়া-মূর্তি তার কাছে বাস্তব। একজন জান্নাৎ-বাসিনী জননী আর একজন ইহলোক বাসিনী মা-মা-।"[১২]

সমাজ এবং ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা বিকাশের প্রতিটি স্তরে ধর্মের ভূমিকা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে আস্তিক-নাস্তিক, ধর্মে আস্থাশীল ও ধর্মে আস্থাহীন মানুষের বিভিন্ন মাত্রার অভিব্যক্তির মাধ্যমে ধর্মের বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা দেখা যায়। অথচ এই ধর্ম কখনও কখনও শাসকশ্রেণির জন্য দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষকে শোষণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এমনই এক ধর্মীয় ভণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া যায় 'মো'জেজা' গল্পে। এই গল্পে দেখা যায়, গল্পকারের গ্রামে হঠাৎ উদয় হয়েছে জহুর মিয়া নামের সাতাশ বছরের এক যুবক। যুবকের মধ্যে অলৌকিক শক্তির আভাস পেয়ে যায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। মক্তবের মৌলবী সাহেব তাকে আশ্রয় দেন। প্রথমে জহুর মিয়া তোতলামির ভান করে, কিন্তু পরে স্পষ্ট স্বরে কোরাণ পাঠ করে সবাইকে চমকে দেয় এবং দাবি করে, তাকে স্বয়ং জিব্রাইল আশীর্বাদ করে গেছেন। এই দাবি শুনে গ্রামের দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে তার প্রতি ভক্তি জাগ্রত হয়। গল্পকারের ভাষায় —

> "যাত্রীর শেষ নাই। যাত্রী আসিতেছে। সঙ্গে পয়সা আসিতেছে। সিকি, দুয়ানি, টাকা। কয়েকজন তো আবার শত টাকার নোটও ছুঁড়িয়া দিল।"[১৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছুদিন পরে, জহুর মিয়া সেই জমা হওয়া দানের টাকা আত্মসাৎ করে আচমকাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। গল্পকার তার এই তিরোধানের রহস্য উদঘাটন করেন পনেরো বছর পরে। দেখা যায়, পূর্ব পরিচিত এই জহুর মিয়া এখন নিজেকে হুজুর হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি ভিন্ন এক স্থানে, পীরের পরিচয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের ভক্তি আদায় করছেন। তার প্রভাব তখন গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কথকের বন্ধু মুস্তাফা খানের নির্বাচনে সুপারিশের মাধ্যমে হুজুর সাহেব বলেন —

> "আমার পেয়ারা মুরিদান। এ-বার আপনাদের এলাকায় সদস্য পদ-প্রার্থী মৌলভী খান সাহেব, আমার সাচ্চা মুরিদান আপনাদের মতোই আমার পেয়ারা। পীর-ভাইএর ইজ্জৎ আপনারা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমি আশা করি। আরজ গোজার শাহ সুফী।"[১৪]

শুধু তাই নয়, কথকের বন্ধু মুস্তাফা খান কৃত্রিম দাড়ি পরে ছবি তুলে, সেই ছবি নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করেছে। গল্পের প্রতারক জহুর, যে এখন ভণ্ড পীর হুজুর হিসেবে পরিচিত এবং কথকের বন্ধু মুস্তাফা খান— দুজনেই ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। জহুর তার জীবিকার জন্য সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদের থেকে অর্থ আদায় করে, আর মুস্তাফা খান তার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। মুস্তাফা খানের কথায়, রাজনৈতিক কৌশলে ধর্মকে ব্যবহার করা যেন সাধারণ ব্যাপার। সে অকপটে বলে ফেলে —

> "কলকাতা গিয়েছিলাম ওইজন্যে। একটা নকল দাড়ী কিনতে হোলো। এই এলাকায় বড় ইলেকশনে বড় জব্দ হতাম নচেৎ। নিজে গেলাম না। ফটো আর আমার সার্টিফিকেট নিজের পেটুয়া লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।"[১৫]

এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট, ধর্মকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে তাদের কোনো দ্বিধা নেই। এভাবে ধর্ম সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে এক ভোগ্য বস্তু হয়ে উঠেছে, যা প্রতারক এবং ক্ষমতালোভীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

'খোওয়াব' গল্পে ধর্মীয় ভণ্ডামির এক অনন্য চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মৌলানা সাহ হরক তুল্লাহ এখানে স্বঘোষিত ধার্মিক, যিনি ধর্মের নাম ভাঙিয়ে লোভ ও লালসার খেলা চালিয়ে যেতে অকুতোভয়ে বদ্ধপরিকর। গল্পে দেখা যায়, তার শিষ্য সওহর আবেগের বশে স্ত্রী রাবেয়াকে তালাক দেয়। পরে ভুল বুঝতে পেরে আবারও তাকে ঘরে তুলতে চায়। কিন্তু ইসলামী শরীয়তের নিয়মে এটি সহজ নয়; স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে তাকে একবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহে প্রবৃত্ত করতে হবে। সেই পরপুরুষের সহবাসের পরই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা সম্ভব। গল্পের নাটকীয়তায়, সওহর তার স্ত্রীকে পীর কেবলার সাথে বিয়ে দিয়ে পরে তালাকের আশায় থাকে। কিন্তু কামনাপরায়ণ পীর তালাক দিতে অস্বীকৃত। গল্পকারের ভাষায় —

> "দরখাস্ত মঞ্জুর হোলো। কিন্তু ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো না। প্রথম রাত্রি যাপনের পর হুজুর বললেন, একজন বেকসুর বে-গোনা আওরৎকে তালাক দিয়ে গোনার ভাগীদার হোতে পারব না। মাল হাত-বদল হোয়ে গেলো। তারপরই শ্রীমতি পীর সাহেবের হেফাজতে (জিম্মাদারীতেও বলা চলে) আছেন। সুন্নত আদায়ের শেষ মওকা দিয়েছেন বলে সওহর-রত্নর রাবেয়ার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। রতনেই রতন চেনে।"[১৬]

ধর্মের নামাবলি পরা মৌলানা হরক তুল্লাহ, তিনজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্যের স্ত্রীর উপর লালসা চরিতার্থ করলে, তার বিবেক নীরবতা ভেঙে তাকে শয়তানের মুখোমুখি করে দাঁড় করায়। আসলে এই শয়তান তো তার নিজেরই নির্মল বিবেক। সেই বিবেকই তাকে সত্যের পথে প্ররোচিত করতে চায়। পীরের মনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে গল্পকারের কথায়—

> "হুজুর হঠাৎ অনুভব করে কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। বুক বেয়ে দর দর ঘাম ছুটছে। শয়তানের ভয়ে টিমটিম আলো জ্বলত সারারাত্রি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা চোখ খুললেন হুজুর। তার এক হাত নিজের গলদেশে অপর হাত রাবেয়ার শীর্ণ কণ্ঠে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। রাবেয়ার জিব বেরিয়ে গেছে। নিস্পন্দ মুখগহব্বর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।"[১৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ গল্পে রাবেয়ার মতো এক নিরীহ নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভণ্ডামি ও কামলালসার নির্মম শিকার হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে পরস্ত্রীকে চিরকাল ভোগ করার যে স্বপ্ন দেখেছিল পীর কেবলা, সেই 'খোওয়াব' বা স্বপ্নই দুঃস্বপ্নের মতো শয়তান হিসেবে তার জীবনে হাজির হয়ে তাঁর মুখোশ উন্মোচন করেছে।

শওকত ওসমানের গল্পগুলির মূলে রয়েছে গ্রাম-বাংলার জীবনচিত্র, যেখানে ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নিমজ্জিত গ্রামবাসীর দারিদ্র্য, কষ্ট ও সীমাহীন দুর্ভোগই প্রধান উপজীব্য। এই গল্পগুলোতে গ্রামীণ জীবনের টানাপোড়েন, সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার আকুতি যেন এক মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে। সুখ-দুঃখের পারস্পরিক মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই মানবিক চিত্রই শওকত ওসমানের প্রথম পর্বের গল্পগুলোর মূল সুর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'ইলেম' গল্পটির কথা। আলোচ্য গল্পে জহির মিয়া, পেশায় এক অতি সাধারণ মাঝি হলেও, নিজের অন্তরের এক অদম্য তাগিদে তিনি তাঁর পুত্র সমিরুদ্দিনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে মনপ্রাণ ঢেলে দেন। তাঁর অশিক্ষিত জীবনের অভাব-অনটনের চাপে পিষ্ট থেকেও তিনি সন্তানের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথে কোনো ছায়া পড়তে দেন না। দারিদ্র্যের কঠিন কষাঘাতকে সহ্য করেও জহির মিয়া সেই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্নে বিভোর থাকেন, যে দিন তাঁর সন্তান শিক্ষার আলোয় একটি দুঃখহীন, দারিদ্র্যমুক্ত জীবন গড়ে তুলবে। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই স্বপ্নে বিপর্যয় নেমে আসে। একদিকে অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তির আশায় যখন তিনি ডাক্তারের ঔষধে স্বস্তি খুঁজে পান না, তখন আশ্রয় নেন আফিমে। এরই মাঝে কাস্টমস অফিসারের চোখে পড়লে আফিম রাখার দায়ে তাঁকে মারধর করে এবং থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। পরিত্রাণ আসে এক কনস্টেবলের হাত ধরে— মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এই পুরো ঘটনায় জহির মিয়ার চোখে শিক্ষিত সমাজের একটি কুৎসিত চেহারা ফুটে ওঠে, যাকে তিনি কেবলই দেখে এসেছিলেন আলোর উৎস হিসেবে। তার মনে এক গাঢ় ধারণার জন্ম নেয়— এই তথাকথিত শিক্ষিতরা আসলে নীতিহীন, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর। এবং এখানেই ঘটে তাঁর মোহমুক্তি। পুত্রের শিক্ষার স্বপ্নটি তিনি নিজেই নস্যাৎ করে দেন, কারণ তাঁর কাছে মনে হয়, এই শিক্ষা কেবলই সুট-টাই পরা লোকদের আড়ালে থাকা কপটতার মুখোশ। তাঁর হতাশার ভাষায় ফুটে ওঠে সেই তিক্ততা—

> "হালার ইলেম! সুট বুট আর গুস। আরে বুট-সুট মারানীর পুত। সুট পাছাৎ, গুস মুখে, এই ইলেমে হৈব কী? বেজন্মার জাত!"[১৮]

এই একখণ্ড অভিজ্ঞতায়, জহির মিয়ার মনে শিক্ষিত সমাজের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জন্মে যায়, আর সেই শিক্ষা যা তাঁর জীবনের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে, তার প্রতি বিদ্বেষে তিনি তার সন্তানকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে নিজের জীবনের সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।

'তুচ্ছ স্মৃতি' গল্পটি সীমাহীন দারিদ্র্যের অনিবার্য পরিণতি চিত্রিত করেছে। আহাদ মিয়া তরমুজের খেতে দাঁড়িয়ে হারানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে; তার মেয়ে জাহানারার মুখের শেষ বায়নাটিই তার অন্তরে গভীর ক্ষতচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে। বিগত বছর জাহানারা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর আগে শুধু একবার তরমুজ খেতে চেয়েছিল, এমন ছোট্ট একটি ইচ্ছে, যা তার দরিদ্র পিতার সাধ্যের অতীত ছিল। গল্পকারের ভাষায়—

> "না, আমাকে তরমুজ দাও— তরমুজ দাও। ...কচি ওষ্ঠের সেই শেষ মুখর গুঞ্জরণ।"[১৯]

এই গল্পের আখ্যান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পের সহায়হরিকে মনে করিয়ে দেয়। সেখানে ক্ষেন্তির জন্য সামান্য পুঁইশাক জোগাড় করতে পারেনি সহায়হরি। এখানেও দেখা যায় একই বেদনাবিধুর পরিণতি। জাহানারা ও ক্ষেন্তি, দুজনেই দারিদ্র্যের নির্মম ছোবলে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। তাদের শেষ চাওয়া পূরণ করতে না পারা বাবা-মায়ের বুকে রয়ে গেছে শূন্যতার অনিঃশেষ ব্যথা।

'নতুন জন্ম' মানবজীবনের কঠোর সংগ্রামের নিখুঁত চিত্রায়ণ। ফরাজ আলি ও তার পুত্র আক্কাসের সংসারে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান যেন এক চিরকালীন সংকট। জীবিকার প্রধান অবলম্বন গোমতী নদী— নদীর বুকে নৌকা চালানোই তাদের জীবনের পথ। কিন্তু গোমতীর চিরন্তন ভাঙন আর প্রতিকূল স্রোত, কখনো কখনো ভয়ংকর রূপে হাজির হয়ে এই নদী তীরবর্তী মানুষদের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। গল্পের শেষ দৃশ্যে, বন্যার তাণ্ডবে সব হারিয়ে ভেসে যাওয়া সংসারের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ফরাজ আলি ও তার পুত্র আক্কাস কেবল অপেক্ষা করে নতুন ভোরের। গল্পকার লিখছেন—

"বিবস্ত্র পিতার পাশে গামছা-পরিহিত পুত্র। দুইজনে ভোরের প্রতীক্ষা করে।"[২০]

এই অপেক্ষার মাঝেই যেন তাদের সংগ্রাম ও অদম্য জীবনীশক্তি ফুটে ওঠে— এক নতুন দিনের আশায়, নতুন জীবনের আশা।

'প্রতীক্ষা' গল্পেও গ্রামীণ সমাজের শোষণ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। গল্পের বাকের চরিত্রের মাধ্যমে শাসকশ্রেণি ও প্রান্তিক মানুষের মধ্যকার ব্যবধান তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী তাহেরার চিকিৎসার জন্য মাত্র ষাট টাকায় নিজের তিন বিঘা জমি বন্ধক রেখে সেই জমির পুনরুদ্ধারে আট বছর পেরিয়ে গেলেও বাকেরের মতো সাধারণ মানুষের জীবনের অসহায়ত্ব মখদুম সাহেবের কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। রোগশয্যায় থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বাকের। গল্পকারের ভাষায় —

> "বাকের চাহিয়া থাকে। ঐত সড়কের পথ। কোন পথিক আসে না। বাতাসে পদধ্বনি শোনা যায় না। বাঁশ-বন শুধু-শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ...বৈকালে তাহেরা আসিয়া দেখিল, বাকের সড়কের দিকে চাহিয়া আছে, সে-চোখে শুধু এতটুকু দৃষ্টিও নাই, নিষ্পলক চাহিয়া আছে মাত্র।"[২১]

'দেনা' গল্পে কাবুলিওয়ালা আগা সলিমের নির্দয় মনোভাব ও নিঃস্বার্থবিহীন বাণিজ্যিক চরিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। সলিমের মূল উদ্দেশ্য যে কোনো মূল্যে অর্থলাভ— এমনকি এতিম শিশু ভুলী এবং তার দুঃস্থ নানি আবিদন বিবির প্রতি সামান্যতম সহানুভূতি বা মানবিকতা পর্যন্ত তার স্বার্থবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। গল্পে দেখা যায়, আবিদন বিবি ভুলীর জন্য জামাটি বাকিতে নিলেও, তার মৃত্যুর পর দু'বছর পার হয়ে গেলেও সলিম সেই ঋণ আদায়ে নির্মম ও অবিচল রয়ে যায়। আবিদন বিবি ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হলেও তার করুণ অবস্থা সলিমের নির্দয় বাণিজ্যিকতার পথকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। গল্পকারের ভাষায়, সলিমের অমানবিকতা যেন ক্ষুদ্র এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> "সলিমও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় নিশিগ্রস্ত রোগীর মত। আবিদন বিবির ঠোঁটে কি যেন বলার প্রচেষ্টা চলছিল। সলিম আর বিলম্ব করল না। চকচকে টাকাটী খপ করে হাতে তুলেই সে দ্রুত পদক্ষেপে পলাতক চোরের মত পৈঠা বেয়ে ভিটা থেকে নেমে পড়ল।"[২২]

গল্পটি এভাবেই পাঠকদের কাছে এক কাবুলিওয়ালার বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি এবং মানবিকতাহীন নিষ্ঠুরতাকে প্রকাশ্যে হাজির করে, যেখানে তার চোখে স্বার্থবুদ্ধির জয় সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

'শেখজী' গল্পে লেখক এক অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং জীবন-সংগ্রামে অবিচল একজন শ্রমজীবী মানুষের চিত্র এঁকেছেন। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মোড়ানো এই চরিত্রটি সমাজের সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধি। তিনি কখনো লন্ড্রিশ্রমিক, কখনো রাজমিস্ত্রী বা কারখানার শ্রমিকের ভূমিকায় নিযুক্ত থেকে জীবনের কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। সমাজের মানুষদের স্বার্থবুদ্ধি ও চতুরতা দেখে ক্রমেই তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে তিনি একসময়ে হাকিমির পেশাকে গ্রহণ করেন। শেখজীর প্রকৃতির উপর আস্থা গভীর, তাই গাছ-গাছড়ায় তিনি নিরাময়ের বিশ্বাস রাখেন। গল্পকারের ভাষায়, শেখজী নিজেই বলেন—

> "আমি কি করতে পারি বলো। বিদ্যেয় যতটুকু কুলোয় ফাঁকি দিইনি বাবা। আজকাল কতগুলো গাছ-গাছড়া একদম লোকমান হেকিমের মত কাজ করে। সে-গুলোই চালাই।"[২৩]

এই বাক্যগুলো শেখজীর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচায়ক; তিনি প্রচলিত শিক্ষায় তেমন সাফল্য অর্জন না করলেও, প্রকৃতির উদ্ভিদকেই জীবনধারণের অবলম্বন করেছেন। শেখজীর এই সততা, মানবিকতার প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং প্রকৃতির প্রতি অগাধ আস্থা তাকে সাধারণ জীবন থেকে আলাদা করে তুলেছে এবং এক আদর্শ চরিত্রে পরিণত করেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় শওকত ওসমানের সাহিত্যিক মন ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রকৃতি, সমাজ, এবং জীবনবোধকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল। তাঁর গল্পগুলোতে স্বদেশের সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের স্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই পর্বে সমাজের গভীরে প্রোথিত সত্য, ব্যক্তি ও ধর্মের মানসিকতার প্রকাশের মাধ্যমে এক সৃজনশীল বৈচিত্র্যের ধারায় তিনি গল্পগুলোকে গড়ে তুলেছিলেন। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, সংবেদনশীল রুচিবোধ, মানবিকতা, এবং প্রখর শিল্পবোধের সমন্বয়ে তিনি বাঙালি জীবনের অজ্ঞতা, সীমাবদ্ধতা এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 187 - 196
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্ভাবনাকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতিফলন না থাকায়, পাঠক সহজেই লক্ষ করে গল্পকারের বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনার স্বাধীনতা। গ্রামীণ জীবনের আবেগময় চিত্রায়ণ, গ্রামজীবনের অভাব-অনটন এবং মূলত মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গল্পে। সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট এবং দারিদ্র্যের বিভিন্ন রূপ ও প্রভাবও তাঁর গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগের উন্মাদনা, মধ্যবিত্তের সংকট, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, ঔপনিবেশিক শোষণ এবং ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে আঘাত তাঁর গল্পগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। এই পর্বের গল্পগুলোর মাধ্যমে শওকত ওসমান শুধু গ্রামীণ জীবনের দৈন্য এবং সংকটকেই নয়, বরং আধুনিক ভাবনার আলোকে সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকেও গভীর মানবিকতায় প্রকাশ করেছেন, যা তাঁকে গল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

Reference:

১. ওসমান, শওকত, ‘দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস’, ‘পিঁজরাপোল’, গল্পসমগ্র ১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০২১, পৃ. ৯৫
২. ওসমান, শওকত, ‘ভাগাড়’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০
৩. ওসমান, শওকত, ‘হুকুম নড়ে না’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫
৪. ওসমান, শওকত, ‘কাঁথা’, ‘পিঁজরাপোল’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
৫. ওসমান, শওকত, ‘চুহা-চরিত’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭
৬. ওসমান, শওকত, ‘থুতু’, ‘পিঁজরাপোল’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৭. ওসমান, শওকত, ‘পিঁজরাপোল’, ‘পিঁজরাপোল’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৮. ওসমান, শওকত, ‘বকেয়া’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬
৯. ওসমান, শওকত, ‘দুই চোখ কানা’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯
১০. ওসমান, শওকত, ‘সাদা ইমারত’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭
১১. ওসমান, শওকত, ‘ব্যবধান’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৬
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৯
১৩. ওসমান, শওকত, ‘মো’জেজা’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
১৬. ওসমান, শওকত, ‘খোওয়াব’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১
১৮. ওসমান, শওকত, ‘ইলেম’, ‘পিঁজরাপোল’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
১৯. ওসমান, শওকত, ‘তুচ্ছ স্মৃতি’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
২০. ওসমান, শওকত, ‘নতুন জন্ম’, ‘জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
২১. ওসমান, শওকত, ‘প্রতীক্ষা’, ‘সাবেক কাহিনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
২২. ওসমান, শওকত, ‘দেনা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫
২৩. ওসমান, শওকত, ‘শেখজী’, ‘বিগত কালে গল্প’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০